দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও টিআইবির প্রতিবেদন

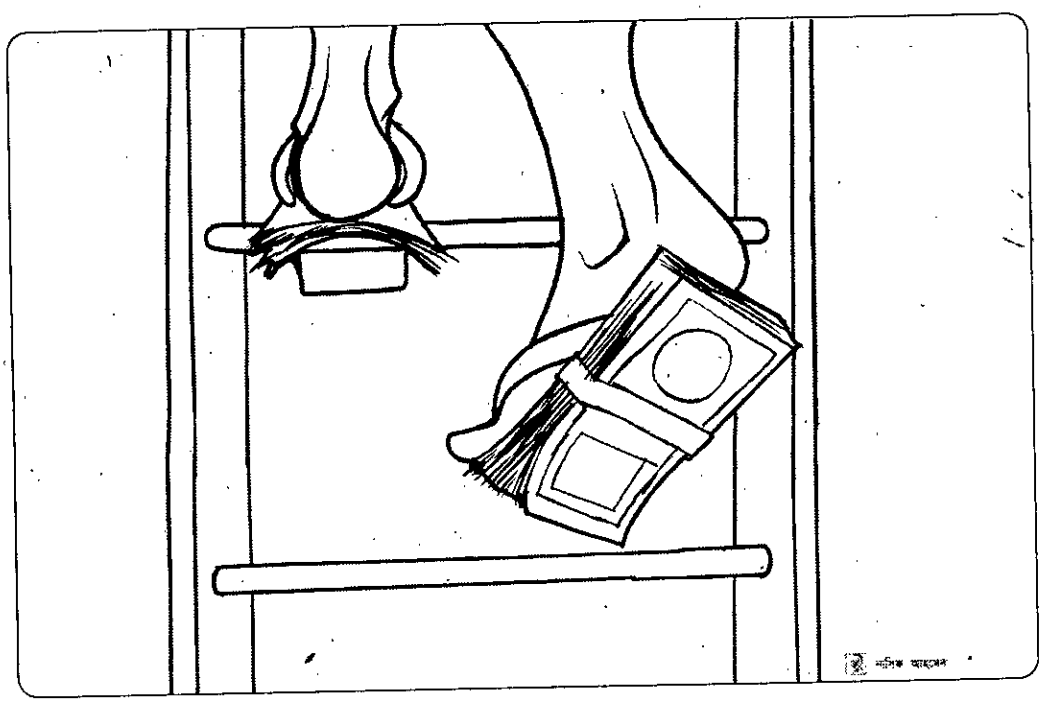

ড. ইকবাল হুসাইন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সম্প্রতি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদনটি ফলাও করে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। টিআইবির ওয়েবসাইট থেকে প্রতিবেদনটি দেখলাম। প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অন্যতম হচ্ছেন শিক্ষক সমিতির ক্ষমতাসীন দলের সদস্য। এদিক থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার এক ধরনের দায় অনুভব করছি।

প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হলেও তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। নিয়োগপ্রাপ্ত মোট কতজন প্রভাষকের মধ্যে শতকরা কতজনের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তারও উল্লেখ নেই। কত শতাংশ প্রভাষক নিয়োগে ঘুষ লেনদেন হয়েছে তাও বলা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ঘটনার (কেস) উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতি-অনিয়ম সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কতটা নির্মোহ, যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। কারণ নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও তাদের নিজেদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা বলবেন না। বঞ্চিত, সংক্ষুব্ধ কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির বক্তব্য কতটা নির্ভুল?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক পরিচয়, স্বজনপ্রীতি এবং আঞ্চলিকতার প্রভাব এখন অনেকটাই ওপেনসিক্রেট। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নজির খুব বেশি আছে বলে মনে হ[illegible] মূলত একজন শিক্ষকও) আর্থিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করবেন– এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে নিয়োগ পাইয়ে দেয়ার কথা বলে অন্য কোন অংশীজন আর্থিক সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের অংশীজন খুব কমই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ৫-৬ বছর আগের একটি ঘটনা বলা যেতে পারে। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি তাকে ফোনে জানালেন, তিনি পরীক্ষায় ভাল করেছেন। তার নিয়োগ হতে পারে। তবে এ জন্য তাকে তিন লাখ টাকা দিতে হবে। শিক্ষক পদের জন্য আবেদনকারী ওই ব্যক্তি জানালেন, এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য তার নেই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা পরিচয় দেয়া ফোনকারী ওই ব্যক্তি সদয় হয়ে টাকার পরিমাণ কিছুটা কমালেন। দরকষাকষির এক পর্যায়ে টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ হাজারে নেমে এলো। এরপর ওই ব্যক্তির সন্দেহ হয়। তিনি আর কোন আর্থিক লেনদেন করেননি। এক সপ্তাহ পর তিনি ডাক বিভাগের মাধ্যমে তার নিয়োগপত্র হাতে পেলেন। অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি হওয়ার পরে কেউ সুযোগ নিতে চেয়েছিল। এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটে। চাকরি পাইয়ে দেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়ার কথা বলে একশ্রেণীর অসৎ মানুষ প্রতারণা করে। অনেকে সে প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়। যোগ্যতা বা মেধার ভিত্তিতে চাকরি বা ভর্তি হতে পারলেও ফায়দা লোটে প্রতারক শ্রেণী। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশের সরকারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। কিন্তু কেবল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়ার সংখ্যাটিও খুব কম নয়। চারপাশে তাকালে অসংখ্য মানুষ পাওয়া যাবে যারা ঘুষ, অনিয়ম, দুর্নীতি, বাবা, মামা-চাচা, বড় ভাই ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু এটি সচরাচর আলোচনায় আসে না। কারণ, তুমুল প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত যতজন নিয়োগ লাভ করেন, নিয়োগ বঞ্চিত হন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। অনেক যোগ্য প্রার্থীও নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হন। নিয়োগবঞ্চিত এবং সংক্ষুব্ধ বিরাট সংখ্যক এসব মানুষ নিয়োগ সম্পর্কে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। তারা তিলকে তাল করেন। নানা ধরনের গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তি কখনও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে পান না। চাকরি বঞ্চিত মানুষের অবস্থাও তাই। আমার বিশ্বাস, টিআইবিতে গত পাঁচ বছরে যারা আবেদন করে নিয়োগ লাভে সক্ষম হননি, কিংবা যারা টিআইবির চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন (বা অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে) তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও অনুরূপ সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসতে পারে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক পরিচয়কে বিবেচনায় নেয়ার চর্চা গত আড়াই দশক থেকে। দিন দিন এ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত জোট সরকারের সময়ে সনাতন ধর্মের কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হলে তার চাকরি হতো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বর্তমান সরকারের সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী হলে তাদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা সমীচীন হবে না। অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, একজন খারাপ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করে ৪-৫ বছর। আর একজন খারাপ শিক্ষক ৪০ বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি সাধন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে শিক্ষার্থীদের মাঝে তিনি আজীবন বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা চালাবেন। সাম্প্রতিক জঙ্গীবাদের আদর্শিক নেতা হিসেবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নাম এসেছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিচর্চা এবং জাতি গঠনে অবদানের কথা বিবেচনায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কেউ (তিনি যতই মেধাবী হোন না কেন) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আদর্শ হতে পারেন না।

টিআইবির প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, আমি মনে করি তা খণ্ডিত। দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষক নিয়োগ হয় তার অধিকাংশই মেধাভিত্তিক। শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান প্রদান করা বা না করার বিষয়টিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন শিক্ষকদের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে। বিশেষ করে ওইসব তরুণ মেধাবী শিক্ষক, যারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষকতার ব্রতকে বেছে নিয়েছেন তারা এখন তাদের ছাত্রছাত্রী, বন্ধু ও পরিচিত মানুষের কাছে কুণ্ঠিত বোধ করবেন। টিআইবি বলেছে, এ প্রতিবেদন দিয়ে সাধারণীকরণ করা সমীচীন হবে না। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে, নেতিবাচক বিষয়ে অধিকতর উৎসাহ বোধ করা এবং এ বিষয়ে চর্চা করা। সুতরাং সবার সাধারণ ধারণা হবে, কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে তাকে কোন না কোনভাবে অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে। মানুষের মধ্যে এরূপ একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা বা হওয়া সমীচীন নয়।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

কেবল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়ার সংখ্যাটিও খুব কম নয়। চারপাশে তাকালে অসংখ্য মানুষ পাওয়া যাবে যারা ঘুষ, অনিয়ম, দুর্নীতি, বাবা, মামা-চাচা, বড় ভাই ছাড়াই চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু এটি সচরাচর আলোচনায় আসে না। কারণ, তুমুল প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত যতজন নিয়োগ লাভ করেন, নিয়োগ বঞ্চিত হন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। অনেক যোগ্য প্রার্থীও নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হন। নিয়োগবঞ্চিত এবং সংক্ষুব্ধ বিরাট সংখ্যক এসব মানুষ নিয়োগ সম্পর্কে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। তারা তিলকে তাল করেন। নানা ধরনের গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তি কখনও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে পান না